OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iii, July 2024, tirj/July 24/article - 49
Website: https://tirj.org.in, Page No. 412 - 419
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iii, published on July 2024, Page No. 412 - 419
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: info@tirj.org.in
(SJIF) Impact Factor 6.527, e ISSN : 2583 - 0848

শান্তিনিকেতনের সূচনাপর্ব ও হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়

ড. পল্লবকুমার সাধু
স্টেট এডেড কলেজ টিচার
শম্ভুনাথ কলেজ
Email ID : sadhupallabkumar@gmail.com

Received Date *16. 06. 2024*
Selection Date *20. 07. 2024*

Keyword
Bangiya Shabdokosha, Penury, Celibacy, Initial Days, Superintendent, Perseverance, Patronage, Manindra Chandra Nandi, Khudiram Basu, Jadunath Chattopadhyay, Patisar, Nishikanta Roy Chowdhury.

Abstract
Haricharan Bandopadhyay (1867-1959), the author of 'Bangiya Shabdokosh,' had a life full of ups and downs, and both his student life and professional life were in the same motion. Despite extreme poverty, he succeeded through his persistence, patience, and discipline. His education stopped for a while due to the need for more funds in B.A third year. He studied in institutions like Champa Pukur School, Baduria L.M.S School, Aarbelia School, etc. He completed the F.A from Kolkata General Assembly's Institution. He took admission in B. A at Metropolitan Institution in 1890 with the fund of Mallick's of Pataldanga. He enlisted his name in B.A under this college. Again, his study was hampered in the fourth year due to insufficient funds. Moreover, he faced the same issue while publishing the masterpiece 'Bangiya Shabdokosh.' At last, Rabindranath Tagore requested Manindra Chandra Nandi, the maharaja of Kashimbazar, to help him financially publish the book. At his request, Manindra Chandra Nandi, the Maharaja of Kashimbazar, patronized it. His work life was also distinctive. He was the principal of Baduria High School. He worked as a home tutor to Devendra Lal Khan at Narazol Rajbari. He was also the principal of Kolkata Town School in 1901. Then, he worked as a superintendent at Kaligram headquarters. Eventually, Rabindranath Tagore invited him to Santiniketan Ashrama. There, he was appointed a professor of Sanskrit Literature for a brief period. He had been going through an acute financial crisis at that time. As a result, after nine years, he joined Kolkata Central College as a professor of Sanskrit. Though he had to leave Santiniketan, he continued his research on the writings of Ramesh Chandra Dutta's, 'Rajput Jibansandhya' and 'Maharastra Jibanprabhat' and Vidyasagar's 'Sitar Banabas.' He even wrote one book in Sanskrit under the guidance of Rabindranath Tagore. He also translated the sonnet 'Sohrab and Rustom' by Matthew Arnold, 'Meghdut' with Rajshekhar Basu, 'Rabindranath-er Katha', and 'Kobir Katha'. He became a prominent figure in the Bengali literary sphere. He was famous as a professor in Santiniketan. Many humorous stories were framed on him. Thus, he was able to write about 'Bangiya Shabdokosh.' His outlook towards life and his diligence are reflected in the songs of Nishikanta Roy Chowdhury and through

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iii, July 2024, tirj/July 24/article - 49
Website: https://tirj.org.in, Page No. 412 - 419
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Dwijendranath Tagore. Thus, he was strongly associated with the initial days of Santiniketan and had been an influential figure in the Bengali literary canon.

Discussion

২১ ফেব্রুয়ারি ১৯২৯ খ্রিস্টাব্দে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর অমিয় চক্রবর্তীকে একটি পত্রে বলেন,

> "তোমাদের প্রতি আমার অনুরোধ এই যে, জিনিষটাকে [শান্তিনিকেতন আশ্রম] আত্মীয়ের মতো দেখো। যদি কোথাও শৈথিল্য ধরা পড়ে তবে দুঃখবোধ ও প্রতিকারের চেষ্টা কোরো। আমার অনুপস্থিতিতেই তোমাদের দায়িত্ব আরো অনেক বেশি এই কথাটি ভুলোনা।"[১]

জীবনের সমস্তটা দিয়ে রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতন সৃষ্টির সংকল্প যেভাবে নিয়েছিলেন সেখানে যেমন ছিল ভারতীয় তপোবনের ঐতিহ্যের অনুসরণ তেমনি অনেক বিষয়েই তিনি ছিলেন উদ্বেগাকুল। শুধুমাত্র 'ক্লাস চালানো'-কে তিনি কখনোই প্রধান অন্বিষ্ট বলে বিবেচনা করতেন না। আত্মীয়তার বন্ধনকে সর্বত্র পরিব্যাপ্ত করে তিনি বিশ্বকে একটি নীড়ে আনতে চেয়েছিলেন। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন,

> "শিলাইদহে পদ্মাতীরে সাহিত্যচর্চা নিয়ে নিভৃতে বাস করতুম। একটা সৃষ্টির সংকল্প নিয়ে সেখান থেকে এলেম শান্তিনিকেতনের প্রান্তরে।"[২]

রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'সৃষ্টির সংকল্প'-কে সফল করতে যে মহাযজ্ঞের আয়োজন করেছিলেন সেখানে অনেকেই স্বয়ং আবার কেউ কেউ গুরুদেবের আহ্বানে নিজেদেরকে নিবেদন করেছিলেন। বিশেষত, শান্তিনিকেতন আশ্রমকে সাফল্যমণ্ডিত করতে আশ্রমগুরুদের ভূমিকা ছিল গুরুত্বপূর্ণ। এমনকী রবীন্দ্রনাথ তাঁর অবর্তমানে তাঁর ছায়াসঙ্গীরূপ এই ঘরের মানুষগুলোর প্রতিই অধিকতর ভরসা করেছেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'জ্ঞানতপস্যার ফল' সমস্ত স্তরের আশ্রমবন্ধুদের মধ্যে প্রসারিত করতে চেয়েছিলেন। হরিচরণের স্মৃতিচারণা সূত্রে অমিয় চক্রবর্তী বলেছেন,

> "দেওয়া-নেওয়ার সম্বন্ধ সত্য হয়ে প্রত্যেকের বৈশিষ্ট্যকে উজ্জ্বলতর করে তুলেছিল। কেন্দ্রে ছিলেন মহাকবি, যিনি একধারে বন্ধু, শিক্ষাগুরু এবং নিত্য উৎসবের সহচর। আদিপর্বের শান্তিনিকেতন সম্বন্ধে এই কথা বিশেষভাবে বলা চলে।"[৩]

কিন্তু সেই পুরোনো দিনের শান্তিনিকেতনে গুরু-শিষ্যের আলাপ-বিস্তারে গুরুর ভূমিকা কেমন হবে সে সম্পর্কেও রবীন্দ্রনাথ মত দিয়েছেন। তিনি বলেছেন,

> "যে গুরুর অন্তরে ছেলেমানুষটি একেবারে শুকিয়ে কাঠ হয়েছে তিনি ছেলেদের ভার নেবার অযোগ্য। উভয়ের মধ্যে শুধু সামীপ্য নয়, আন্তরিক সাযুজ্য ও সাদৃশ্য থাকা চাই, নইলে দেনা-পাওনায় নাড়ীর যোগ থাকে না।"[৪]

শান্তিনিকেতন আশ্রমে ছাত্রদের শিক্ষার ভার নিয়েছিলেন অন্যান্য শিক্ষকদের সঙ্গে হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৬৭-১৯৫৯)। এ প্রসঙ্গে প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় বলেছেন —

> "১৯০২-এর গ্রীষ্মাবকাশের পর বিদ্যালয়ে শিক্ষক রূপে আসিলেন মনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়, হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, সুবোধচন্দ্র মজুমদার, নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য; ইতিপূর্বে ছিলেন জগদানন্দ রায় ও লরেন্স।"[৫]

এছাড়াও, ব্রহ্মচর্যাশ্রমের অধ্যাপক হিসেবে যাঁদের নাম উজ্জ্বল হয়ে আছে তাঁরা হলেন ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়, রেবাচাঁদ, শিবধন বিদ্যার্ণব, সতীশচন্দ্র রায়, রাজেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ। প্রসঙ্গত, বলে নেওয়া ভালো শিক্ষক হিসেবেই প্রথম হরিচরণ

বন্দ্যোপাধ্যায় শান্তিনিকেতনে আসেননি। শান্তিনিকেতনে উপাসনা মন্দিরের ভিত্তি স্থাপন হয় ১২৯৭ বঙ্গাব্দের পরের বছর অর্থাৎ ১২৯৮ বঙ্গাব্দের (১৮৯১ খ্রিস্টাব্দ) ৭ পৌষ তারিখে মন্দির প্রতিষ্ঠার উৎসবে হরিচরণ উপস্থিত ছিলেন। হরিচরণ লিখেছেন —

> "মন্দির প্রতিষ্ঠার কথা প্রসঙ্গে একদিন তিনি (বড়দাদা যদুনাথ চট্টোপাধ্যায়) বলিলেন, 'যদি তুমি এই উৎসব দেখিতে ইচ্ছা কর, তাহা হইলে আমার সঙ্গে যাইতে পার।' যাতায়াতের রেলভাড়া খাওয়া থাকার ব্যবস্থা সরকারী- মহর্ষির আদেশ। শান্তিনিকেতন দেখার ইচ্ছা পূর্বেই ছিল। এক্ষণে এই সুযোগে আসিয়া উৎসব দেখা স্থির করিলাম। ৬ই পৌষ রবিবারে সকালের গাড়িতে বড়দাদার সহিত শান্তিনিকেতনে উপস্থিত হইলাম।"[৬]

১৮৬৭ খ্রিস্টাব্দের ২৩ জুন (১২৭৪ বঙ্গাব্দ ১০ আষাঢ়) রবিবার হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্ম হয় চব্বিশ পরগণার অন্তর্গত মাতুলালয় রামনারায়ণপুরে। প্রবল প্রতিভাবান হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের জীবন সুখের ছিল না। বিশেষত অর্থকষ্ট তাঁকে বারবার পড়াশোনার মতো এক সারস্বত চর্চার প্রতি নিবিষ্ট হয়ে থাকতে দেয়নি এবং শেষ পর্যন্ত তাঁর জীবনের শ্রেষ্ঠ স্মারক 'বঙ্গীয় শব্দকোষ' গ্রন্থটি প্রকাশের ক্ষেত্রেও অর্থের আনুকূল্যতা প্রথমদিকে পায়নি। বিদ্যালয় জীবনে তাঁকে রবীন্দ্রনাথ কর্তৃক অর্থ সাহায্য, পটলডাঙার মল্লিকবাবুদের কাছ থেকে দাক্ষিণ্য গ্রহণ করে লেখাপড়া চালাতে হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের অর্থ সাহায্য অনেকটাই হরিচরণকে প্রাণিত করেছিল। সে-কাহিনি তাঁর নিজের ভাষায় লিপিবদ্ধ করছি, যা ইতিপূর্বে 'রবীন্দ্র-প্রসঙ্গ' গ্রন্থে সন্নিবেশিত হয়েছে —

> "...একদিন তিনি (বড়দাদা) ... আমার লেখাপড়ার নিমিত্ত কিঞ্চিৎ সাহায্য প্রার্থনা করেন। তাঁহার এইরূপ সাহায্য প্রার্থনায় কবি তাঁহার নিকট আমাকে লইয়া যাইতে বলেন। আমি তখন বড়দাদার অফিসেই ছিলাম, ইহার কিছুই জানিতাম না। বড়দাদা আসিয়া আমাকে সকল কথা বলিয়া কবির নিকটে লইয়া গেলেন। কবি তখন স্বর্গীয় দ্বিপুবাবু মহাশয়ের সহিত দোতলার একটি ঘরে জাজিমপাতা বিছানায় বসিয়াছিলেন। আমি বিনীতভাবে নমস্কার করিয়া দাঁড়াইলে, কবি আমাকে বসিতে অনুমতি দিলেন — আমি কবির নিকটে একপাশে বসিলাম। কবি তখন আমাকে লেখাপড়ার সম্বন্ধে কিছু জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন; আমার তাহা মনে নাই। যাহা হউক, পরে শুনিলাম, কবি আমাকে মাসিক কিছু সাহায্য করিবেন বলিয়াছেন। ...আমি দরিদ্র, কবির প্রদত্ত এই বৃত্তি আমাকে যে কত আনন্দ, কত উৎসাহ, কত আশা দিয়াছিল, তাহা অনুমানেরই বিষয়, বলিবার নয়। আমি যাহা কিছু শিখিয়াছি, এই বৃত্তিই তাহার মূল দৃঢ় করিয়া দিয়াছিল। ভবিষ্যৎ জীবনে যাহা কিছু বিদ্যালাভ হইয়াছিল, এই বৃত্তিই তাহার ভিত্তি।"[৭]

হরিচরণের মহতী সাধনা 'বঙ্গীয় শব্দকোষ'। এই শব্দকোষ গ্রন্থটি রবীন্দ্রনাথের স্নেহানুকূল্যে এবং মণীন্দ্রচন্দ্রের অর্থানুকূল্যে সমাপ্ত হয়েছিল। পাশাপাশি এও স্মরণীয়, শিক্ষাজীবন অতিক্রম করে হরিচরণের কর্মজীবনে প্রতিষ্ঠালগ্নে রবীন্দ্রনাথের আনুকূল্য তাঁকে পুনঃপুনঃ প্রাণবন্ত ও সজীব করে রেখেছিল যেমন, তেমনি তাঁকে অনেকটাই গুরুদেবের কাছাকাছি করেছিল। সম্পর্কের এই ক্রমশ গভীরতার অভিজ্ঞানগুলোই হরিচরণকে তাঁর স্বপ্নের পথে এগিয়ে দিয়েছে। প্রথমে বড়দাদা কর্তৃক কবিকে অনুরোধে পতিসরে সদর কাছারির সুপারিন্টেনডেন্ট হলেন হরিচরণ। এরপর জমিদারি পরিদর্শনে এসে রবীন্দ্রনাথের কৌতূহল ও তজ্জনিত জিজ্ঞাসায় পাল্টে গেল হরিচরণের জীবন।

পতিসরে জমিদারি পরিদর্শনে এসে রবীন্দ্রনাথ হরিচরণকে ডেকে পাঠালে এই অপ্রত্যাশিত আহ্বান তাঁকে একটু অবাক করেছিল। এরপর রবীন্দ্রনাথ হরিচরণ কী কাজ করে জিজ্ঞাসা করায় সে বলে 'আমিনের সেরেস্তায়' এবং 'রাত্রিতে কী কর?' এর জবাবে সে জানায়, —

> "সন্ধ্যার পরে কিছুক্ষণ সংস্কৃতের আলোচনা করি ও কিছুক্ষণ একখানি বই-এর পাণ্ডুলিপি দেখে প্রেসের কপি (Press Copy) প্রস্তুত করি।"[৮]

এর কিছুদিন পরে পতিসরের ম্যানেজারকে [শৈলেশ] রবীন্দ্রনাথ লিখে পাঠান, তার সংস্কৃতজ্ঞ কর্মচারীকে [হরিচরণ] এখানে [শান্তিনিকেতনে] পাঠিয়ে দেবার জন্য। হরিচরণ যখন তার বড়দাদার মুখে শুনেছিলেন ব্রহ্মচর্যাশ্রমের কথা তখন থেকেই তার মনে ব্রহ্মচর্যাশ্রমে অধ্যাপনার স্পৃহা এবং আকর্ষণ দুই-ই বাড়তে থাকে। ছাত্রাবস্তা থেকেই গড়ে ওঠা এই সুপ্ত আশা পূরণের প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন —

> "কবি আমাকে সঙ্গে লইয়া তাঁহার কাছে [তৎকালীন অধ্যক্ষ কালীপ্রসন্ন চৌধুরী] আনিয়া পরিচয় দিয়া স্নানাহারের ব্যবস্থা করিতে বলিয়া গেলেন। এতদিনে আমার আশা সফল হইল — আমি ব্রহ্মচর্যাশ্রমে অধ্যাপক হইলাম।"[৯]

যে পথ অতিক্রম করে হরিচরণ শান্তিনিকেতেন আশ্রমে গুরুকূলের একজন হয়েছিলেন তা ছিল কণ্টকাকীর্ণ। তাঁর শিক্ষাজীবন চার বছর বয়সে পৈতৃক গ্রাম মশাইকাটি (মতান্তরে যশাইকাটি)-তে শুরু হয়ে অধিকাংশ সময়েই স্তব্ধ হয়েছে অর্থ সংকটের কারণে। বি.এ তৃতীয় বর্ষে স্টুডেন্টস ফাণ্ডের টাকা বন্ধ হওয়ায় তাঁর পড়াশোনা সাময়িক বিচ্ছিন্ন হয়। কিন্তু প্রবল অর্থকষ্টের মধ্যেও হরিচরণ তাঁর পাঠচর্চাকে নানা বিদ্যায়তনে পাঠের মধ্যে দিয়ে জারি রেখেছিলেন। বসিরহাট মাইনর স্কুলে পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত পড়ার পর, চাঁপাপুকুর স্কুল, বাদুড়িয়া এল. এম. এস স্কুল (লন্ডন মিশনারী স্কুল), আড়বেলিয়া স্কুল হয়ে ধান্যকুড়িয়া বিদ্যালয়ের পাঠ সমাপ্ত করে কলকাতা জেনারেল অ্যাসেমব্লিজ ইনস্টিটিউশন (বর্তমান স্কটিশচার্চ কলেজ) থেকে এফ. এ পড়েন। এছাড়াও, পটলডাঙার মল্লিকদের ফাণ্ড থেকে মাসিক বেতনের আশ্বাস পেয়ে তিনি ১৮৯০ সালে মেট্রোপলিটন ইনস্টিটিউশনে ভর্তি হন। এরপর তিনি ঐ কলেজেই বি.এ ক্লাসে নাম নথিভুক্ত করেন। কিন্তু চতুর্থ বর্ষে টাকা বন্ধ হওয়ায় এবং সহৃদয় দাতা না পাওয়ায় তাঁর পড়াও বন্ধ হয়েছিল। এরপরই হরিচরণের কর্মজীবন নানা স্রোতে বইতে থাকে। বাদুড়িয়া হাইস্কুলে হেডপণ্ডিত হিসেবে যোগদান করে তিনি কর্মজীবন শুরু করেন। এর পরে সামান্য বর্ধিত বেতনে ধান্যকুড়িয়া হাইস্কুলে তৃতীয় শিক্ষক হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তী ১৯০০ সাল নাগাদ নাড়াজোল রাজবাড়িতে দেবেন্দ্রলাল খানের গৃহশিক্ষক রূপে আনুমানিক দেড় বছর অতিক্রান্ত করে পুনরায় ১৩০৮ বঙ্গাব্দে(১৯০১ খ্রিস্টাব্দ) কলকাতা টাউন স্কুলে হেডপণ্ডিতের পদ অলংকৃত করেন। এর পর ১৩০৮ বঙ্গাব্দের শ্রাবণ মাসে কালীগ্রাম পরগণার সদর কাছারি পতিসরে সুপারিনটেনডেন্ট হিসেবে নিযুক্ত হন। পরে কবির আহ্বানে তিনি শান্তিনিকেতন আশ্রমে সংস্কৃতের অধ্যাপক হিসেবে যোগদান করেন। ১৩১৮ বঙ্গাব্দের গ্রীষ্মাবকাশ পর্যন্ত তিনি এই কর্মে বহাল ছিলেন এবং ১৩১৮ বঙ্গাব্দের আষাঢ় মাসে হরিচরণ কলকাতা সেন্ট্রাল কলেজে যোগদান করেন সংস্কৃতের অধ্যাপক রূপে। তাঁর এই শেষোক্ত কর্মপ্রবেশ সম্পর্কে একটি তথ্য হল, হরিচরণ তাঁর আর্থিক অনটনের কথা জানিয়ে রবীন্দ্রনাথকে একটি পত্র দিলে নিরুপায় রবীন্দ্রনাথ তাঁকে অন্যত্র কাজের সন্ধান করতে বলেন। প্রসঙ্গত, হরিচরণের আত্মকথা দেখে নেওয়া যেতে পারে—

> "অভিধান রচনা কিয়দ্দূর অগ্রসর হইলে ১৩১৮ সালের আষাঢ় মাসে আর্থিক অসঙ্গতির জন্য আশ্রমের শিক্ষকতায় অবসর লইয়া আমাকে কলিকাতায় আসিতে হয়। এই সময়ে আমি একদিন শ্যামবাজারের দিকে যাইতেছিলাম, পথে অধ্যাপক ক্ষুদিরাম বসু মহাশয়ের সহিত দেখা হয়। তিনি আমাকে দেখিয়া কুশল প্রশ্নাদির পর জিজ্ঞাসা করিলেন — 'তুমি এখন কি করছ?' আমি বলিলাম, 'কলিকাতায় চাকুরীর সন্ধানে এসেছি।' শুনিয়া তিনি বলিলেন — 'বেশ, তুমি আজ কিম্বা কাল হতে আমার কলেজে সংস্কৃত অধ্যাপনার কাজ কর।' তাঁহার কথানুসারে আমি সেন্ট্রাল কলেজে কার্য্য গ্রহণ করিলাম।"[১০]

শান্তিনিকেতনে ব্রহ্মচর্যাশ্রম স্থাপিত হয়েছিল ১৩০৮ সালের পৌষ মাসে। হরিচরণ আশ্রমের কাজে যোগ দিয়েছিলেন ১৩০৯ সালে শ্রাবণের শেষ ভাগে। খুব অল্পদিনের ব্যবধানে (মাত্র নয় বছর) তাঁকে অর্থ সংকটের কারণে শান্তিনিকেতন থেকে চলে যেতে হলেও তাঁর শান্তিনিকেতনের প্রতি দরদ এবং আবেগ দুটোই ছিল। শৈশব থেকে লালন করে চলা আশ্রমের অধ্যাপনায় তিনি বেশ তৃপ্ত হয়েছিলেন —

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iii, July 2024, tirj/July 24/article - 49
Website: https://tirj.org.in, Page No. 412 - 419
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

> "একদিন কবি জিজ্ঞাসা করিলেন, 'হরিচরণ, তুমি কি এই স্থানেই অধ্যাপনা করবে না পতিসরে ফিরে যাবে?' আমি উত্তরে জানাইলাম, 'আশ্রমের কাজ আমার ভালোই লাগছে, আমি আর পতিসরে যেতে ইচ্ছা করি না।'"[১১]

আশ্রমে মূলত হরিচরণ বাংলা ও সংস্কৃত পড়াতেন। রমেশচন্দ্র দত্তের 'রাজপুত জীবনসন্ধ্যা' এবং 'মহারাষ্ট্র জীবনপ্রভাত' এবং বিদ্যাসাগর রচিত 'সীতার বনবাস' তাঁর অধ্যয়ন ও অধ্যাপনার বিষয় ছিল। আশ্রমের কাজে যোগ দেবার কিছু দিনের মধ্যেই তাঁকে গুরুদেবের নির্দেশ মতো একখানি সংস্কৃত পুস্তক রচনার কাজ সম্পূর্ণ করতে হয়। বিষয়টি বিশদ করা যেতে পারে। আশ্রমে সংস্কৃত শিক্ষার সময় উপস্থিত হলে অন্য কোনো সুযোগ না থাকায় কবি স্বয়ং একটি গ্রন্থ রচনায় মনোনিবেশ করেন। সংস্কৃত শিক্ষা বিষয়ক এই গ্রন্থটি হেমচন্দ্র ভট্টাচার্যের সহযোগিতায় ১৮৯৬ খ্রিস্টাব্দে 'সংস্কৃত পাঠ' নামে রচিত ও প্রকাশিত হয় দুই খণ্ডে। কবিগুরু প্রণীত সহজ সংস্কৃত শিক্ষাপ্রণালীকে আরো প্রসারিত করার দায়িত্ব পড়ে হরিচরণের উপর। হরিচরণও গুরুদেবের আজ্ঞাবহ হয়ে তিন খণ্ডে 'সংস্কৃত প্রবেশ' রচনা করেন। এ প্রসঙ্গে মনে রাখা উচিত, পতিসরে রবীন্দ্রনাথ কর্তৃক হরিচরণের সংস্কৃত পাণ্ডুলিপি দর্শনের কথা। হরিচরণের প্রতি রবীন্দ্রনাথের আস্থা অর্জন তাই এক্ষেত্রে আকস্মিক নয়। এ প্রসঙ্গে গবেষক দেবাঙ্গন বসুর মন্তব্য এরকম —

> "কাজে যোগ দেবার পরেই হরিচরণের ওপর দায়িত্ব পড়ল রবীন্দ্রনাথ যে কাজ সদ্য শুরু করেছিলেন সেই ৬-৭ পৃষ্ঠা রচিত 'সংস্কৃত প্রবেশ' পুস্তকটি সম্পূর্ণ করার। রবীন্দ্রনাথের নির্দেশানুসারে হরিচরণ তিন খণ্ডে এই ছাত্রপাঠ্য পুস্তকটি রচনা করলেন।"[১২]

কিন্তু, ইতিপূর্বে 'সাহিত্য ও সংস্কৃতি' পত্রিকার শ্রাবণ-আশ্বিন ১৩৭৪ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত এবং তাপস ভৌমিক সম্পাদিত কোরক পত্রিকার (জানুয়ারি ২০১৬) হরিচরণ সংখ্যায় পুনর্মুদ্রিত সমালোচক অমিয়কুমার সেন 'মহাসাধক হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়' নামক প্রবন্ধে মন্তব্য করেছেন, হরিচরণ তিন খণ্ডে রচনা করেন 'সংস্কৃত প্রবেশ'। গ্রন্থটি ১৯০২-১৯০৩ সালে শ্রীহরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত ও শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সম্পাদিত এই আখ্যাপত্র সহযোগে প্রকাশিত হয়। অমিয়কুমার সেন আরো বলেছেন, হেমচন্দ্র ভট্টাচার্যের সহযোগিতায় দুই খণ্ডে 'সংস্কৃত পাঠ' প্রকাশিত হয়। রবীন্দ্রনাথের শুরু করা কাজটি 'সংস্কৃত প্রবেশ' নামাঙ্কিত ছিল না। পাশাপাশি এটিও বিস্ময় জাগায়, পূর্বজ সমালোচক যাকে বলেছেন, '৬-৭ পৃষ্ঠা সংস্কৃত রচনা' হরিচরণ কর্তৃক সম্পূর্ণ করার কথা, সেক্ষেত্রে সমালোচক অমিয়কুমার সেন দুই খণ্ড রচনা ও প্রকাশিত হবার পর 'এই কাজের পরবর্তী অধ্যায়ের দায়িত্ব' হরিচরণ পেয়েছিলেন বলে মন্তব্য করেছেন —

> "রবীন্দ্রনাথ সংস্কৃত শিক্ষার একটি সহজ পদ্ধতি নিয়ে বহুদিন ধরে মনে মনে আলোচনা করছিলেন। তার ফলে হেমচন্দ্র ভট্টাচার্যের সহযোগিতায় দুই খণ্ড 'সংস্কৃত পাঠ' রচিত ও প্রকাশিত (১৮৯৬) হয়। ... পতিসরে হরিচরণের সংস্কৃত পাণ্ডুলিপি দেখে তাঁকে এই কাজের পরবর্তী অধ্যায়ের দায়িত্ব দেবার কথা স্থির করেছিলেন, একথা অনুমান করা যেতে পারে। হরিচরণও এই দায়িত্ব পালন করে তিন খণ্ডে 'সংস্কৃত প্রবেশ' রচনা করেন।"[১৩]

আলোচক দেবাঙ্গন বসুর রবীন্দ্রনাথ কর্তৃক সদ্য শুরু করা ৬-৭ পৃষ্ঠা সংস্কৃত প্রবেশ এই ধরনের মন্তব্যে আমরা বিস্মিত হই, যখন তাঁরই সম্পাদিত 'আভিধানিকের আত্মকথা' (২০১৫) গ্রন্থের তেইশ পৃষ্ঠায় চোখ পড়ে। পাঠকদের স্বার্থে জানিয়ে রাখি, এখানে সন্নিবেশিত হয়েছে হরিচরণের আত্মজীবন সম্পর্কে কিছু মূল্যবান ছবি, যা ইতিপূর্বে 'প্রবাসী' (ফাল্গুন ১৩৬৪) পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। পূর্বোক্ত সম্পাদিত গ্রন্থে সংস্কৃত পাঠ্যপুস্তক প্রসঙ্গে হরিচরণের আত্মবচন এরকম —

> "আশ্রমে ছাত্রদের তখন কোনও সংস্কৃত পাঠ্যপুস্তক ছিল না। কবি একদিন আমাকে একখানি ছয়-সাত পাতার খাতা দিয়া বলিলেন — 'এই প্রণালীতে তুমি সংস্কৃত পাঠ্য লেখ।' আমি তাঁহার আদেশে বালকদিগের পাঠোপযোগী, সহজবোধ্য 'সংস্কৃত প্রবেশ' পাঠোন্নতিক্রমে তিন খণ্ডে শেষ করি।'[১৪]

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iii, July 2024, tirj/July 24/article - 49
Website: https://tirj.org.in, Page No. 412 - 419
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

লক্ষ করার মতো, রবীন্দ্রনাথ হরিচরণকে 'ছয়-সাত পাতার খাতা' দিয়েছিলেন — যা পূর্বোক্ত আলোচক তাঁর কোরক সাহিত্য পত্রিকায় প্রকাশিত (১৪১৮ বঙ্গাব্দ) 'হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়: সৃষ্টির আকীর্ণ পথ' প্রবন্ধে এ প্রসঙ্গে মন্তব্য করেছেন — 'হরিচরণের ওপর দায়িত্ব পড়ল রবীন্দ্রনাথ যে কাজ সদ্য শুরু করেছিলেন সেই ৬-৭ পৃষ্ঠা রচিত সংস্কৃত প্রবেশ পুস্তকটি সম্পূর্ণ করার।' (পৃ. ৩১১) সমালোচকের মন্তব্যে এবং হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের আত্মকথনে এই মিলহীনতা চোখে পড়ার মতো।

হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মহতী কীর্তি 'বঙ্গীয় শব্দকোষ'। এই কোষগ্রন্থ নির্মাণের পরতে পরতে জড়িয়ে আছে শান্তিনিকেতন, রবীন্দ্রনাথের উপদেশ, বিভিন্ন জনকে হরিচরণের জন্য অর্থনৈতিক আনুকূল্যের অনুরোধ আর সর্বোপরি হরিচরণের দীর্ঘ শ্রম। ১৩১২ বঙ্গাব্দে এই অভিধান রচনার কাজ শুরু করে ১৩৫২ সাল পর্যন্ত দীর্ঘ চল্লিশ বছর শব্দ অন্বেষণ করে পাঁচ খণ্ডে সমাপ্ত করেন। বৌদ্ধ গান ও দোহা, শ্রীকৃষ্ণকীর্তন, শূন্যপুরাণ, মঙ্গলকাব্য, রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতি স্থান থেকে গৃহীত হয়েছে শব্দ এবং নবীন কিছু বাংলা গ্রন্থের উল্লেখযোগ্য শব্দও 'বঙ্গীয় শব্দকোষ'-এ সংকলিত হয়েছে। এই পথ ছিল তাঁর সম্পূর্ণ একার —

> "নিজেই গ্রন্থাগারে প্রাচীন ও আধুনিক বাংলার পুস্তক যাহা - কিছু পাইয়াছিলাম, তাহা পড়িয়া শব্দ, বাক্যাংশ (phrase) সংগ্রহ করিয়া সংগৃহীত শব্দসমূহ সংস্কৃত শব্দের সহিত মাতৃকাবর্ণানুক্রমে সাজাইয়া অভিধান আদ্যোপান্ত নিজের হাতেই লিখিয়াছি, ইহাতে কাহারো এক বর্ণেরও সাহায্য পাই নাই।"[১৫]

কিন্তু একটি সাক্ষাৎকারে (৩০ নভেম্বর ২০১৫) বর্তমান প্রবন্ধ লেখককে শ্রীঅনাথনাথ দাস (ইনি হরিচরণকে চাক্ষুস করেছেন) জানিয়েছেন, তিনি দেখেছেন তার শিক্ষক দুর্গেশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে এবিষয়ে আলোচনারত হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে। শ্রমসাধ্য এই কাজটি নিয়ে শান্তিনিকেতনের আশ্রমিক থেকে শুরু করে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের আগ্রহের সীমা ছিল না। ২৭ বৈশাখ ১৩১৮ সালে রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীকে একটি চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ জানান —

> "আমাদের অধ্যাপক হরিচরণ একখানি বাংলা অভিধান রচনায় নিযুক্ত হইয়াছেন আপনারা যাহা চান ইনি তাহাই করিয়া তুলিতেছেন। ব্যাপারখানি প্রকাণ্ড হইবে। একবার দেখিয়া দিবেন। যদি পছন্দ হয় তবে এটা লইয়া কি করা কর্তব্য স্থির করিয়া দিবেন। বাংলা সাহিত্যে যে সকল সংস্কৃত শব্দ ব্যবহার হয় না এমন শব্দও ইহাতে স্থান পাইয়াছে সেইটে আমার আছে সঙ্গত বোধ হয় না। মোটের উপর এ গ্রন্থখানি রচিত ও প্রকাশিত হইলে দেশের একটি মহৎ অভাব দূর হইবে।"[১৬]

এই গ্রন্থটি কীভাবে অর্থনৈতিক প্রতিকূলতা কাটিয়ে মুদ্রণ সৌভাগ্য লাভ করবে এই চিন্তাও রবীন্দ্রনাথকে পীড়িত করেছিল। অভিধান রচনার কাজ কিছুটা অগ্রসর হওয়ার পরে অর্থনৈতিক কারণে এই মহৎ সূচনা স্তব্ধ হয়ে যায়। পরে রবীন্দ্রনাথের অনুরোধে কাশিমবাজারের মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুরের অর্থনৈতিক আনুকূল্য হরিচরণকে চিন্তামুক্ত করে। কিন্তু সম্পূর্ণ গ্রন্থ মুদ্রিত আকারে তাঁর অভিধান রচনার এই দুই নেপথ্য কাণ্ডারীকে উপহার না দিতে পারায় আমৃত্যু হরিচরণ ব্যথিত হয়েছেন। কারণ, গ্রন্থ প্রকাশকালে মণীন্দ্রচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ উভয়েই পরোলোক গমন করেছেন। শব্দকোষ গ্রন্থ রচনার পাশাপাশি হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর সাহিত্যচর্চাকে অনুবাদ, খণ্ডকাব্য রচনা, রবীন্দ্র-বিষয়ক প্রবন্ধ রচনা প্রভৃতির মধ্যে বিস্তৃত রেখেছিলেন। এরকম একটি সম্ভাব্য তালিকা হল— অমিত্রাক্ষর ছন্দে ম্যাথু আর্নল্ডের 'সোরাব ও রস্তম' (১৩১৬-১৩১৭) অনুবাদ, সহযোগী লেখক রাজশেখর বসুর সঙ্গে 'মেঘদূত' (১৩৫১)-এর বঙ্গানুবাদ, 'রবীন্দ্রনাথের কথা' (১৩৫০), 'কবির কথা' (১৩৬১), সংস্কৃত 'অধ্যাত্ম রামায়ণ' (১৮৯৪-১৮৯৫)-এর বঙ্গানুবাদ। শেষোক্ত গ্রন্থটি মৃত্যুর পর 'দেবযান' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। এছাড়াও 'দেশ', 'যুগান্তর' এবং 'মাতৃভূমি' পত্রিকায় প্রকাশিত 'কবিকথা মঞ্জুষিকা' নামক একটি রচনার কথাও জানা যায়। পাশাপাশি 'দেশ' পত্রিকার দশম বর্ষ, চতুর্থ সংখ্যায় প্রকাশিত 'রবীন্দ্রপ্রসঙ্গের পরিশিষ্ট'(১৯৪২) প্রবন্ধটি নানা দিক দিয়ে উল্লেখযোগ্য একটি রচনা।

কঠোর অনুশীলন আর অধ্যবসায় হরিচরণকে করে তুলেছিল এক ভিন্ন মানুষ। তাঁর কঠোর নিয়মানুশীলন এবং অভিনিবেশ নিয়ে শান্তিনিকেতনে প্রচলিত ছিল বেশ কিছু কৌতুককর গল্প। যেমন, তিনি প্রাতঃভ্রমণে কতদূর পর্যন্ত হাঁটবেন তার নির্দেশ ছিল একটি তালগাছ। তাঁর যাওয়া এবং ফিরে আসা দেখে আশ্রমের অনেকেই সময় আন্দাজ করতেন বলে আশ্রমিকদের অনেকের মুখে শোনা গেছে। আবার, একদিন গুরুদেব দিনেন্দ্রনাথের সঙ্গে আলাপের সময় শুনতে পেলেন শিক্ষকদের বাসগৃহ থেকে ভেসে আসা সেতারের আওয়াজ। রবীন্দ্রনাথ দিনেন্দ্রনাথকে জিজ্ঞাসা করলে সে হরিচরণের কথা বলে। তখন রবীন্দ্রনাথ সেতারের 'রে'-র ঘাঁটটি ঠিক না থাকায় উদ্বেগ প্রকাশ করলে দিনেন্দ্রনাথ হেসে উত্তর দেয় সেটা হরিচরণের পক্ষে অনাবশ্যক। তাঁর বাজাবার সময় তাই সেতার বাজছে। শুধুমাত্র হরিচরণকে নিয়ে কৌতুককর গল্প নয় — তাঁর জীবনাচারণ, তাঁর স্বভাব উঠে এসেছে গানে। নিশিকান্ত রায়চৌধুরী হরিচরণের বাড়ি সম্পর্কে এরকমই একটি গান রচনা করেছিলেন —

"তারপরেতে বাবু হরি,
আছেন তিনি কলম ধরি,
লিখেন বসে ডিকশেনরি-
সারাজীবন সাধনা।"

কিংবা শান্তিনিকেতনের নিষ্ঠাবান কর্মী হরিচরণ সম্পর্কে দ্বিজেন ঠাকুরের শ্লোকটি ছিল এ রকম—

"কোথা গো ডুব্ মেরে রয়েছ তলে
হরিচরণ কোন্ গরতে?
বুঝেছি, শব্দ অবধি জলে
মুঠাচ্ছ খুব অরথে।।"

শান্তিনিকেতনের প্রথম যুগের ইতিহাসে এভাবেই গানে-গল্পে আলোচিত নাম ছিল হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়। এই মহান ব্যক্তিত্বকে বিশ্বভারতী নানাভাবে বরণ করেছিল তাঁর জীবৎকালে। ১৩৫৩ সালে বিশ্বভারতী আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে এক হাজার টাকা উপহারসহ হরিচরণকে সম্মান জানায়, বিশ্বভারতীর সুপারিশক্রমে তৎকালীন রাষ্ট্রপতি রাজেন্দ্রপ্রসাদ ১৯৫৫ খ্রিস্টাব্দের মার্চ মাস থেকে হরিচরণকে মাসিক পঁচাত্তর টাকা বৃত্তি মঞ্জুর করেন। সর্বোপরি ১৯৫৭ খ্রিস্টাব্দে বিশ্বভারতীর সমাবর্তন অনুষ্ঠানে আচার্য জহরলাল নেহেরু হরিচরণকে সর্বোচ্চ সম্মান 'দেশিকোত্তম' প্রদান করেন।

বাংলা বিদ্যাশৃঙ্খলার নবীন প্রজন্মের কাছে হরিচরণ যে আলোচিত নাম একথা একটু ভেবে বলতে হয়। কেউবা 'বঙ্গীয় শব্দকোষ'-এর মধ্যেই হরিচরণের মোটের উপর এক ধরনের সীমা টেনে নেন। কিন্তু শুধুমাত্র ব্রহ্মচর্যাশ্রমের অধ্যাপকই নন, শান্তিনিকেতনে হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন একটি প্রসারিত ক্ষেত্র। ছাত্র তৈরির পাশাপাশি তাঁকে ছাত্রদের আহারের ব্যবস্থা, আয়-ব্যয়ের হিসেব সবকিছুই করতে হত। এমনকী শান্তিনিকেতনের আশ্রমিক এবং বিদ্যার্থীদের উদ্যোগে 'আনন্দবাজার' নামে যে মেলা অনুষ্ঠিত হয়ে চলেছে এবং এই মেলা থেকে সংগৃহীত অর্থ যে ভাণ্ডারে জমা হত, শান্তিনিকেতনের কাজ থেকে অবসর গ্রহণ করা পর্যন্ত হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় এই ভাণ্ডারের ভারপ্রাপ্ত অধ্যাপক ছিলেন। ১৯৫৯ খ্রিস্টাব্দে এই মহাজীবন পৃথিবীর বন্ধন ছিন্ন করে চলে গেলেও তিনি আমাদের কাছে বিস্মৃত হননি। একদিকে আভিধানিক, অন্যদিকে অধ্যাপক পাশপাশি শান্তিনিকেতনে বিচিত্র কর্মযজ্ঞে তাঁর প্রচেষ্টা কখনোই বাঙালিকে তার প্রতি অমনোযোগী করে তুলতে পারে না। ঋতুবদল যেমন অতি সহজেই শান্তিনিকেতনের মানুষজনের কাছে তার উপস্থিতি জানিয়ে যায়, তেমনি আম্রকুঞ্জ কিংবা সিংহসদন আজও হয়তো উজ্জ্বল হয়ে থাকে আশ্রমের মাস্টারমশাই হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় স্মৃতি সুধায়। এভাবেই হরিচরণ জীবিত থাকুন শান্তিনিকেতনে এবং বিশ্বজনের কাছে।

Reference:

১. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, চিঠিপত্র ত্রয়োদশ খণ্ড (৫১ নং পত্র), বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলকাতা, পুনর্মুদ্রণ: মাঘ ১৪১৭, পৃ. ৮১

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iii, July 2024, tirj/July 24/article - 49
Website: https://tirj.org.in, Page No. 412 - 419
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

২. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, দ্র. রবীন্দ্র-পরিচয়, উমা দাশগুপ্ত কর্তৃক লিখিত শান্তিনিকেতন ও শ্রীনিকেতন অংশ, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলকাতা, পুনর্মুদ্রণ: আশ্বিন ১৪১২, পৃ. ৯২

৩. চক্রবর্তী, অমিয়, হরিচরণের রবীন্দ্রনাথের কথা প্রসঙ্গে, দ্র. তাপস ভৌমিক (সম্পা.), হরিচরণ, কোরক সংকলন, প্রথম প্রকাশ: জানুয়ারি ২০১৬, পৃ. ১৩৫

৪. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, আশ্রমের শিক্ষা, দ্র. রবীন্দ্র-পরিচয়, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলকাতা, পুনর্মুদ্রণ: মাঘ ১৪১৭, পৃ. ১০

৫. মুখোপাধ্যায়, প্রভাতকুমার, শান্তিনিকেতন-বিশ্বভারতী, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, আষাঢ় ১৪১২, পৃ. ৩৪

৬. সেন, অমিয়কুমার, মহাসাধক হরিচরণ মুখোপাধ্যায়, দ্র. তাপস ভৌমিক(সম্পা.), হরিচরণ, কোরক সংকলন, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ: জানুয়ারি ২০১৬, পৃ. ৬১

৭. তদেব, পৃ. ৫৯-৬০

৮. বন্দ্যোপাধ্যায়, হরিচরণ, দ্র. আত্মপরিচয়, রবীন্দ্র-প্রসঙ্গ, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলকাতা, মাঘ ১৪০৬, পৃ. ১৮

৯. তদেব, পৃ. ১৮-১৯

১০. বন্দ্যোপাধ্যায়, হরিচরণ, জীবনস্মৃতি, (ইতিপূর্বে প্রকাশ: প্রবাসী, ফাল্গুন ১৩৬৪), দ্র. দেবাঙ্গন বসু(সম্পা.), আভিধানিকের আত্মকথা, সূত্রধর, কলকাতা, ২০১৫, পৃ. ২৫

১১. বন্দ্যোপাধ্যায় হরিচরণ, দ্র. আত্মপরিচয়, রবীন্দ্র-প্রসঙ্গ, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলকাতা, মাঘ ১৪০৬, পৃ. ১৯

১২. বসু, দেবাঙ্গন, হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়: সৃষ্টির আকীর্ণ পথ, দ্র. তাপস ভৌমিক(সম্পা), কোরক সাহিত্য পত্রিকা, কলকাতা, প্রাক শারদ ১৪১৮, পৃ. ৩৩১

১৩. সেন, অমিয়কুমার, মহাসাধক হরিচরণ বন্দ্যোধ্যায়, দ্র. তাপস ভৌমিক(সম্পা.), হরিচরণ, কোরক সংকলন, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ: জানুয়ারি ২০১৬, পৃ. ৬৪-৬৫

১৪. বন্দ্যোপাধ্যায়, হরিচরণ, জীবনস্মৃতি (ইতিপূর্বে প্রকাশ: প্রবাসী, ফাল্গুন ১৩৬৪), দ্র. দেবাঙ্গন বসু(সম্পা.), আভিধানিকের আত্মকথা, সূত্রধর, কলকাতা, ২০১, পৃ. ২৩

১৫. বন্দ্যোপাধ্যায়, হরিচরণ, দ্র. আত্মপরিচয়, রবীন্দ্র-প্রসঙ্গ, বিশ্বভারতী, গ্রন্থনবিভাগ, কলকাতা, মাঘ ১৪০৬, পৃ. ১৯

১৬. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, চিঠিপত্র পঞ্চাদশ খণ্ড(৩০ নং পত্র), বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলকাতা, পৃ. ৭০

কৃতজ্ঞতা :

১. শ্রী সৌরীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভ্রাতুষ্পুত্র)

২. শ্রী দ্বীপেশ রায়চৌধুরী (আশ্রমিক এবং হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যাকে নিবিড়ভাবে প্রত্যক্ষ করেছেন)

৩. শ্রী অনাথনাথ দাস (অধ্যাপক, পাঠভবন, বিশ্বভারতী)

৪. শ্রী অতনু শাশমল (অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, বিশ্বভারতী)